রুম নম্বর দুই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

০১. নিরুপমা হোটেলের ম্যানেজার........2

০২. নিরুপমা হোটেলের রান্না ভাল........36

০১. নিরুপমা হোটেলের ম্যানেজার

নিরুপমা হোটেলের ম্যানেজার হরিশচন্দ্র হোড় ঘুম ভেঙেই ঘড়ি দেখলেন–সাড়ে, ছটা। তিনি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। ইঃ, আজ বেজায় দেরি হয়ে গেছে। তিনি ডাকলেন, ‘গুণধর!’

তকমা-উর্দি পর সদর খানসামা গুণধর এসে দাঁড়াল। শীর্ণকান্তি অত্যন্ত কর্মকুশল চৌকশ লোক, হোটেলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি নজর আছে। হরিশচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বেড-টি দেওয়া হয়েছে?’

গুণধর বলল, ‘আজ্ঞে। তেতলার সবাই চা নিয়েছেন, কেবল দোতলার দুনম্বর ঘরে টোকা দিয়ে সাড়া পেলাম না।’

হরিশচন্দ্র বললেন, ‘দোতলার দু’নম্বর–রাজকুমারবাবু। পনেরো মিনিট পরে আবার টোকা দিও।–বাজারে কে গেছে?’

‘জেনারেলকে নিয়ে সরকার মশায় গেছেন।’

‘বেশ। আমার চা নিয়ে এস।’ হরিশচন্দ্র উঠে কক্ষ-সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

রাসবিহারী অ্যাভেন্যু ও গড়িয়াহাটার চৌমাথা থেকে অনতিদূরে নিরুপমা হোটেল। দেশী হোটেল হলেও তার ভাবভঙ্গী একটু বিলিতি-ঘেষা। চাকরেরা খানসামার মত তকমা-উর্দি পারে, সদর দরজার সামনে সকাল বিকেল জেনারেলের মত সাজপোশাক পরা দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সেলাম করে। তিনতলা বাড়ির প্রত্যেক তলায় আটখানি ঘর। নীচের তলায় ম্যানেজারের দু'টি ঘর, বাসকক্ষ ও অফিস; টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো ডাইনিং রুম; রান্নাঘর, বাবুর্চিখানা, চাকরদের ঘর, স্টোর-রুম ইত্যাদি। হোটেলে দেশী ও বিলিতি দুরকম খাদ্যই পাওয়া যায়, যার যেমন ইচ্ছা খেতে পারেন। হোটেলে থাকার মাশুল বিলিতি হোটেলের চেয়ে কম, কিন্তু সাধারণ দেশী হোটেলের চেয়ে বেশি। ছোট হোটেল, তাই অধিকাংশ সময়ই পূর্ণ থাকে, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতিথি এখানে আসেন।

আধঘণ্টা পরে হরিশচন্দ্র বাথরুম থেকে বিলিতি পোশাক পরে বেরুলেন। দোহারা আকৃতির লোক, তাই কোট-প্যান্ট পরলে বেশ মানায়; বয়স আন্দাজ পায়তাল্লিশ, চোখের দৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা এবং সংসারবুদ্ধি পরিস্ফুট।

টেবিলের ওপর চা এবং প্রাতরাশ সাজিয়ে গুণধর দাঁড়িয়ে ছিল, হরিশচন্দ্র খেতে বসলেন। চা টেস্ট মাখন ও দু'টি অর্ধ সিদ্ধ ডিম। আহারের সময় হরিশচন্দ্র কথা বলেন না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রাতরাশ শেষ করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'রাজকুমারবাবুর খবর আর নিয়েছিলে?'

গুণধার বলল, 'আজ্ঞেজ্ঞ, এবারও সাড়া পাওয়া গেল না।'

হরিশচন্দ্র ভ্রূকুটি করলেন। তারপর উঠে অফিস-ঘরে গেলেন। দেরাজ থেকে চাবির গোছা নিয়ে পকেটে ফেললেন, 'চল, দেখি।'

ফাল্গুন মাস হলেও সাতটার সময় বেলা চড়েছে; কলতলায়, রান্নাঘরে, ডাইনিং রুমে বিষ্ণু-চাকরের কর্মতৎপরতা। আটটার সময় অতিথিদের ব্রেক-ফার্স্ট দিতে হবে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে হরিশচন্দ্র পশ্চাদ্বর্তী গুণাধরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাত্তিরে

গুণধর বলল, 'আজ্ঞে, ছিলেন। রাত্রি পৌঁনে ন'টার সময় আমি নিজের হাতে তাঁকে ডিনার পৌছে দিয়েছি।'

'রাত্তিরে সদর দরজা। কখন বন্ধ হয়েছিল?'

'আপনি ফিরলেন এগারোটার সময়, তারপর আমি সদর বন্ধ করেছি।'

দোতলায় এক সারিতে আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ির মুখেই ঘরের নম্বর আরম্ভ হয়েছে। সব দরজা ভেজানো। হরিশচন্দ্র দুনম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু কড়াভাবে টোকা দিলেন।

কেউ সাড়া দিল না। হরিশচন্দ্র তখন ডাক দিলেন, 'রাজকুমারবাবু!'

এবারেও সাড়া এল না। হরিশচন্দ্র আরো গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রাজকুমারবাবু!' তবু সাড়া নেই। হরিশচন্দ্র তখন দোরের হ্যান্ডেল ঘোরালেন, কিন্তু হ্যান্ডেল ঘুরল না। দোরে ইয়েল তালা লাগানো, চাবি না ঘোরালে বাইরে থেকে দোর খুলবে না।

হরিশচন্দ্র পকেট থেকে চাবির গোছা বার করলেন। এই সময় দুনম্বর ঘরের দুদিক থেকে দরজা খুলে দু'টি মুণ্ড উঁকি মোরল। এক নম্বর থেকে যিনি উঁকি মারলেন তিনি একটি বর্ষীয়সী। মহিলা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?' তিন নম্বর ঘর থেকে গলা বাড়িয়েছিলেন মধ্যবয়স্ক একটি পুরুষ; বললেন, ম্যানেজারবাৰ্‌ু, আমার জ্বর হয়েছে শীগগির একজন ডাক্তার ডেকে পাঠান।

মহিলাটি বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'আমি ডাক্তার।' তিনি হরিশ্চন্দ্বকে পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরের সামনে গেলেন। তিন নম্বরের অধিবাসী শচীতোষ সান্যাল আরক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে একবার ডাক্তারের পানে তাকালেন, তারপর দরজা থেকে সরে গিয়ে বললেন, 'আসুন।'

হরিশচন্দ্র গোছা থেকে চাবি বেছে নিয়ে তালায় পর্যালেন, দরজা একটু ফাঁক করে ভিতরে দেখলেন; কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর দরজা টেনে আবার বন্ধ করে দিলেন।

বারান্দায় কেউ নেই। হরিশচন্দ্র এদিক ওদিক তাকিয়ে খাটো গলায় গুণধারকে বললেন, ‘গুণধর, তুমি এখানে থাকো, কোথাও যেও না। আমি এখনি আসছি।’ তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা। উত্তেজনায় শীৎকারের মত শোনাল।

তিনি পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলেন। তিন নম্বর ঘরে মহিলা ডাক্তার শোভনা রায় রোগী শচীতোষ সান্যালকে বিছানায় শুইয়ে তাঁর টেম্পরেচার নিলেন, নাড়ি দেখলেন, জিভ পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, ‘কিছু নয়, সামান ঠাণ্ডা লেগেছে। দুটো অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকুন।’

শচীতোষ বললেন, ‘জ্বর কত?’

‘নাইনটি-নাইন।’

‘গায়ে যে ভীষণ ব্যথা।’

‘ও কিছু নয়। দো-রসার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যায়। আমি অ্যাসপিরিনের বড়ি পাঠিয়ে িিচ্ছ!’

‘আপনার ফি কত?

‘ফি দিতে হবে না।’

তিন নম্বর থেকে বেরিয়ে শোভনা রায় দেখলেন, গুণধর দুনিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ঘরে কী হয়েছে?'

গুণধর কেবল মাথা নাড়ল। শোভনা রায় আর কোনো প্রশ্ন না করে নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন।

নীচে হরিশচন্দ্র তখন নিজের অফিস-ঘর থেকে পুলিসকে ফোন করছেন, 'শীগগির আসুন, খুন হয়েছে–!'

গত রাত্রে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকারের বাড়িতে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের নেমন্তন্ন ছিল। সরকার মশায় দক্ষিণ কলকাতার একটি থানার অধিকারী থানাদার। ব্যোমকেশরা যখন কেয়াতলায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল; পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হলো। সরকার মশায় পুলিস হলেও অত্যন্ত মিশুক এবং সহৃদয় বুড়ি বয়সে বোমকেশের চেয়ে কিছু ছোট, তাই বন্ধুত্বের সঙ্গে অনেকখানি সম্ভ্রম মেশানো ছিল।

ব্যোমকেশের সঙ্গে অজিতও এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। গল্পসল্প চলল। অনেক রাত পর্যন্ত। রাত বাড়ল কিন্তু গল্প শেষ হলো না। খাওয়া-দাওয়ার পর অজিত উঠি-উঠি করছে দেখে রাখালবাবু বললেন, 'ব্যোমকেশদা, আপনি আজ রাতটা না হয় এখানেই থেকে যান। কাল সকালে একেবারে বড়ির কাজ তদারক করে বাসায় ফিরবেন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'মন্দ কথা নয়। অজিত তুমি আজ ফিরে যাও, আমি কাল কাজকর্ম দেখে ফিরব।'

অজিত চলে গেল। কলকাতা শহরে এপাড়া থেকে ওপাড়া যাওয়া বিদেশ-যাত্রার সমান।

পরদিন সকাল পৌনে আটটার সময় ব্যোমকেশ চা-জলখাবার খেয়ে বেরুবার উপক্রম করছে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রাখালবাবু ফোন ধরে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনলেন : দুএকটা কথা বললেন, তারপর ফোন রেখে দিয়ে ব্যোমকেশকে বললেন, 'থানা থেকে বলছিল। আমার এলাকায় একটা হোটেলে খুন হয়েছে। বেশ রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?'

ব্যোমকেশ বলল, 'রহস্যময় খুন! নিশ্চয় যাব।'

ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার ব্যোমকেশকে নিয়ে যখন নিরুপমা হোটেলে পৌঁছুলেন তখন থানা থেকে দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে হোটেল দখল করেছে। সদর দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলের লোককে হোটেলে রাখা হয়েছে, বাইরের লোককে বাইরে।

রাখালবাবু, হরিশচন্দ্রের অফিসে প্রবেশ করে দেখলেন, পুলিসের ডাক্তার কালো ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রাখালবাবু বললেন, ‘এই যে ডাক্তার এসে গেছেন দেখছি– আপনি হোটেলের ম্যানেজার?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘আপনিই লাশ আবিষ্কার করেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

ইন্সপেক্টর সরকার এবং ব্যোমকেশ বক্সী পাশাপাশি চেয়ারে বসলেন, রাখালবাবু বললেন, ‘বেশ। আপনি কী জানেন সংক্ষেপে বলুন।’

আজ সকাল থেকে যা যা ঘটেছিল হরিশচন্দ্র বললেন। শুনে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকালেন, ব্যোমকেশ একটু ঘাড় নাড়ল। রাখালবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আপনি ঠিক কাজ করেছেন। চলুন ডাক্তার, এবার লাশ পরিদর্শন করা যাক।।’

হরিশচন্দ্র আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চললেন; তাঁর পিছনে রাখালবাবু, ব্যোমকেশ ও ডাক্তার।

দোতলায় দুনম্বর ঘরের সামনে গুণধরের বদলে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হরিশচন্দ্র চাবি দিয়ে ঘর খুলে দিলেন। তখন ঘরের ভিতরটি দেখা গেল।

ঠিক দরজার সামনে মেঝের ওপর একটি পুরুষের মৃতদেহ ডানদিকে কত হয়ে পড়ে আছে; পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। মুখখানা দেখে চমকে উঠতে হয়; কেউ যেন ধারালো ছুরি দিয়ে মুখখানাকে ফাল-ফালা করে কেটেছে, তারপর অত্যন্ত অযত্নভরে আবার জোড়া দিয়েছে। কাটা দাগগুলো তাজা নয়, অনেকদিনের পুরনো; শুকনো ক্ষতের দাগ মুখখানাকে কদাকার করে দিয়েছে।

মৃত্যুর কারণ কিন্তু অন্যত্র। গেঞ্জির বুকের ওপর খানিকটা রক্ত শুকিয়ে আছে।

দোরের কাছ থেকে কিছুক্ষণ মৃতদেহ পরিদর্শন করে রাখালবাবু বললেন, ‘ডাক্তার, আপনি আগে লাশ পরীক্ষা করুন। আপনার কাজ হয়ে গেলে আমরা ঘরে ঢুকব।’

ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করলেন, বাকি তিনজন লাশের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যোমকেশ একবার আড়চোখে হরিশচন্দ্রের মুখের পানে তাকালো, কিন্তু সেখানে ভয়ার্তি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

‘কী ব্যাপার বলুন দেখি? আমাকে এখনি বেরুতে হবে, কিন্তু পুলিস বেরুতে দিচ্ছে না। এর মানে কি?’ মহিলা কণ্ঠের উষ্ণ স্বর শুনে তিনজনে পিছু ফিরে তাকালেন। একটি মহিলা ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কে?’

হরিশচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিলেন, ‘ইনি এক নম্বর ঘরে থাকেন, ডক্টর মিসেস শোভনা রায়।’

রাখালবাবু মিনতির সুরে বললেন, ‘দেখুন, এই ঘরে কাল রাত্রে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। এ হোটেলে যাঁরা আছেন। সকলকেই আমাদের জেরা করতে হবে। জেরা করার আগে কাউকে বাইরে যেতে দিতে পারি না। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সকলের আগে আমি আপনাকে জেরা করে ছেড়ে দেব।’

মহিলাটির মুখের ভাব বদলে গেল, তিনি শঙ্কিত চক্ষে চেয়ে বললেন, ‘খুন হয়েছে! আমার পাশের ঘরে খুন হয়েছে। কখন? কে খুন করেছে?’

ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে বললেন, ‘তা এখনো জানা যায়নি। আপনি নিজের ঘরে গিয়ে বসুন, আমরা এখনি আসছি।’

মহিলাটি একটু ইতস্তত করলেন, একবার দুনম্বর ঘরের দিকে উঁকি মারলেন, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর দু’জন উপস্থিত হয়েছিল, রাখালবাবু তাদের বললেন, ‘তোমরা একজন তেতলায় এবং একজন দোতলায় যত অতিথি আছেন। সকলের নাম-ধাম

ঠিকানা নিয়ে নাও, কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল খবর নাও। কেবল এক নম্বর আর তিন নম্বর ঘরে তোমাদের যাবার দরকার নেই, ওঁদের আমি জেরা করব।'

সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন চলে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'এবার লাশ সরাতে পারেন।'

রাখালবাবু বললেন, 'কি দেখলেন?'

ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে; ছুরি কিংবা ওই রকম কোনো সরু ধারালো অস্ত্র। পাঁজরার ফাঁক দিয়ে একেবারে হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করেছে। এ পেশাদার খুনীর কাজী : ওই একটি বই ক্ষতচিহ্ন নেই, প্রথম মারেই মর্মস্থানে পৌঁচেছে।'

'হুঁ। মৃত্যুর সময়?'

'অটপ্সি না করে নিশ্চয়ভাবে বলা শক্ত, সম্ভবত কাল রাত্রি নটা থেকে বারোটার মধ্যে।'

ব্যোমকেশ বলল, 'মুখের দাগগুলো কতদিনের পুরনো?'

'দশ বারো বছরের কম নয়।' 'বয়স কত হবে? মুখ দেখে তো বোঝা যায় না।'

‘চল্লিশের আশেপাশে–আচ্ছা, এখন আমি চলি। তাড়াতাড়ি লাশ পাঠিয়ে দেবেন, আজই কাটবো। কাল রিপোর্ট পাবেন।’ ডাক্তার চলে গেলেন।

রাখালবাবু হরিশচন্দ্রকে বললেন, ‘আপনি নিজের কাজে যান। অফিসেই থাকবেন। এ ঘরের চাবিটা আমায় দিন।’

আধঘণ্টা পরে লাশ চালান করে দিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। অর্থাৎ— অতঃ কিম?

ব্যোমকেশ এক নম্বর ঘরের দিকে আঙুল দেখালে, ‘মহিলাটির সওয়াল-জবাব আগে সেরে নিন। মহিলা এবং ডাক্তারের অধিকার আগে।’

‘ঠিক ঠিক। ওঁকে ছেড়ে দিয়ে তারপর এ ঘরটা দেখা যাবে।’ রাখালবাবু দুনম্বরের দোরে চাবি দিয়ে বললেন, ‘আসুন।’

এক নম্বরের দোরে টোকা দিতেই দোর খুলে গেল। মহিলাটির মুখ অপ্রসন্ন। তাঁর বেঁটে নিরেট গোছের শরীরটি আঁটসাঁট পোশাকের মধ্যে যেন অধীরতায় ফেটে পড়বার উপক্রম করছে। তিনি বললেন, ‘যত শীগগির পারেন আমাকে ছেড়ে দিন দারোগাবাবু। আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে।’

'দুচারটে প্রশ্ন করেই আপনাকে ছেড়ে দেব।' রাখালবাবু খাতা পেন্সিল বার করে প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, 'আপনার পুরো নাম?'

'মিসেস শোভনা রায়।'

'বয়স?'

'উনপঞ্চাশ।'

'স্বামীর নাম?'

'স্বর্গীয় রামরতন রায়।'

'আপনি ডাক্তার। কোথায় ডাক্তারি করেন?'

'বহরমপুরে।'

'কলকাতায় এসেছেন কেন?'

‘আমি গাইনকোলজিস্ট, প্রধানত স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা করি। সেবা সদনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, মাঝে মাঝে আসি।’

‘কলকাতায় আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?’

‘আমার কোথাও কেউ নেই।’

‘ছেলে।পুলে?’

না। একটা মেয়ে ছিল, অনেকদিন মরে গেছে।’

মিসেস রায়ের মুখ ক্ষণেকের জন্য কঠিন হয়ে উঠল, তারপর আবার স্বাভাবিক হলো। মহিলাটির মুখখানি সুশ্রী নয়, কঠিন হলে আরো কুশ্রী দেখায়।

‘কলকাতায় যখন আসেন। এখানেই ওঠেন?’

‘হ্যাঁ। এখানে উঠলে সুবিধে হয়।’

‘এবার কবে এসেছেন?’

‘পরশু।‘

'কাল রাত্রে পাশের ঘরে রাজকুমার বসু নামে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। তাঁকে আপনি চিনতেন?'

'না, কখনো নাম শুনিনি।'

'আগে কখনো দেখেননি? পাশাপাশি ঘরে ছিলেন। তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'না। ও মুখ দেখলে মনে থাকত।'

'কাল রাত্রি আটটার পর আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আটটার সময় আমি সেবা সদন থেকে ফিরে আসি।। ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে নীচে ডাইনিং রুমে খেতে গেলুম। ন'টার আগেই ঘরে ফিরে এলুম। তারপর আর ঘর থেকে বেরোইনি।'

'রাত্রে কিছু জানতে পেরেছিলেন?'

'আমি সওয়া ন'টার সময় শুয়ে পড়েছিলুম; কিন্তু বার বার ঘুমের বিঘ্ন হচ্ছিল। পাশের ঘরের শব্দে চটকা ভেঙে যাচ্ছিল।'

‘পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছিল?’

‘ঘরে শব্দ হচ্ছিল। কিনা শুনতে পাইনি। কিন্তু ঘরের দরজা বার বার খুলছিল। আর বন্ধ হচ্ছিল।’

‘রাত্রি তখন কত?’

‘ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ সাড়ে ন’টা থেকে দশটার মধ্যে।’

‘আপনি কিছু করলেন?’

‘কী করব! হোটেলে অনেক অবিবেচক লোক আসে, তারা পরের সুবিধা অসুবিধা বোঝে না।’

‘আজ সকলে কখন জানতে পারলেন?’

‘খুন হয়েছে আপনার কাছে জানলাম। ভোরবেলা চাকর বেড়-টি দিয়ে গেল। তারপর আমি তৈরি হয়ে বেরুতে যাচ্ছি, নীচে ব্রেক-ফার্স্ট খেয়ে কাজে যাব, এমন সময় পাশের ঘরে দোর-ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি শুনতে পেলুম। বেরিয়ে দেখলুম ম্যানেজার; জিজ্ঞেস করলুম কী হয়েছে, সে কিছু বলল না। তারপর তিন নম্বর ঘরে গেলাম—’

‘তিন নম্বর ঘরে গেলেন কেন?’

‘তিন নম্বরের ভদ্রলোকটির শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার খুঁজছিলেন। তাই তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম।’

‘তাকে আগে থাকতে চিনতেন বুঝি?

‘দেখেছি। কিন্তু চেনা-পরিচয় কিছু ছিল না। তাঁর নামও জানি না।

‘ও-কি হয়েছে ভদ্রলোকের?’

‘ঠাণ্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছে।’

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন, ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে জানাল আর কোনো প্রশ্ন নেই। রাখালবাবু শোভনা রায়কে বললেন, ‘আপাতত আর কোনো প্রশ্ন নেই, আপনি কাজে যেতে পারেন। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে কলকাতা ছাড়বেন না।’

শোভনা রায়ের মুখ বিরক্ত হয়ে উঠল। তিনি উত্তর না দিয়ে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালেন।

দুনম্বর ঘরের দরজা খুলতে খুলতে রাখালবাবু বললেন, ‘মহিলাটির মেজাজ একটু কড়া। ভয় পাননি; বোধহয় পুলিসের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় আছে। ডাক্তার তো।—যাহোক,

আসুন দেখা যাক ঘরের মধ্যে আততায়ী কোনো চিহ্ন রেখে গেছে। কিনা।–কনস্টেবল হাজরা, তুমি নীচে গিয়ে হেড-অফিসে ফোন করে–যেন ফিঙ্গারপ্রিণ্ট এক্সপার্টদের পাঠানো হয়।' কেলেস্টরল সালুট করে চলে গেল। য়াখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে

ঘরটি আয়তনে দশ ফুট বাই বারো ফুট। একটি একহারা লোহার খা্িট; ছোট টেবিল এবং চেয়ার, দেয়ালে আয়না লাগানো। তার পাশে কাপড় রাখার আলনা; মাথার ওপর ফ্যান। দু'জনে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

রাখালবাবু বললেন, 'বিছানাটা দেখেছেন?'

'দেখেছি। বিছানা এবং আলনা— দুইই দ্রষ্টব্য।'

বিছানা দেখে মনে হয় কাল রাত্রে রাজকুমার বসু বিছানায় শুয়েছিল; চাদর একটু কুঁচকে আছে, বালিশের ওপর মাথার দাগ। আলনায় একটি কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি টাঙানো রয়েছে।

রাখালবাবু বললেন, 'হুঁ। কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে কাল রাত্রে রাজকুমার বসু কাপড় পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে শুয়েছিল। তারপর একসময় দোরে টোকা পড়ল। রাজকুমার বিছানা থেকে উঠে যেই

দোর খুলল আততায়ী অমনি বাইরে থেকে তার বুকে ছুরি মারল। রাজকুমার পড়ে গেল। আর উঠল না। আততায়ী দরজা টেনে বন্ধ করে চলে গেল। আমার বিশ্বাস আততায়ী ঘরে ঢোকেনি, ফিঙ্গারপ্রিণ্ট এক্সপার্ট রাজকুমার ছাড়া আর কারুর আঙুলের ছাপা ঘরের মধ্যে পাবে না। দোরের হাতলে আততায়ীর আঙুলের ছাপা হয়তো ছিল, কিন্তু এখন আর পাওয়া যাবে না। তার ওপর আরো অনেক আঙুলের ছাপা পড়েছে।'

রাখালবাবু বললেন, 'তা বটে। তবু অধিকন্তু ন দোষায়। আসুন, ঘরটা তল্লাশ করে দেখা যাঁক।?

ব্যোমকেশ বলল, 'আপনি তল্লাশ করুন। আমি কোনো জিনিসে হাত দেব না, তাতে আঙুলের ছাপ বেড়ে যাবে।'

'বেশ, আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে তদারক করুন।'

রাখালবাবু বিধিবদ্ধভাবে তল্লাশ আরম্ভ করলেন। টেবিলের দেরাজ, পাঞ্জাবির পকেট, বিছানার তেশকের নীচে, সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু কিছু পেলেন না। অবশেষে খাটের তলা শুধু একটা সুটকেস টেন বার করলেন। মৃতের এই একটিমাত্র মাল ধরে আছে, আর কিছু নেই।

সুটকেসের গায়ে চাবি লাগানো ছিল, রাখালবাবু ডালা তুললেন। দেখা গেল, দু' সেট জামাকাপড় রয়েছে। কাপড়ের নীচে এক গোছা দশ টাকার নোট, আর একটি ডায়েরির আকারের ছোট বাঁধানো খাতা।

খাতাটি সরিয়ে রেখে রাখালবাবু প্রথমে দশ টাকার নোটগুলি গুনলেন; একশো কুড়িখানা নোট, অর্থাৎ ঠিক ১২০০ টাকা। তিনি নোটগুলি নিজের পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, যে খুন করেছে তার টাকার লোভ নেই।' তিনি খাতাটি তুলে নিলেন।

খাতার নাম পৃষ্ঠায় নাম লেখা রয়েছে–সুকান্ত সোম। রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ বলল, 'রাজকুমার নামটা তাহলে মেকি। কিন্তু–সুকান্ত সোম! যেন কোথায় শুনেছি, মাথার মধ্যে একটা ঘন্টি বাজছে। আপনি শোনেননি?'

'মনে পড়ছে না।' রাখালবাবু খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন। প্রত্যেক পাতার মাথায় একটি শহরের নাম, যেমন–কাশী কলকাতা কটক। শহরের নীচে কয়েকটি নাম ও ঠিকানা, সম্ভবস্থলে টেলিফোন নম্বর। কলকাতার পাতায় চারটি নাম লেখা আছে, প্রায় প্রত্যেক নামের পাশে একটি টাকার অঙ্ক। যথা—

মোহনলাল কুণ্ডু
১১৭ডি, পানাপুকুর লেন
শ্যামাকান্ত লাহিড়ী ৫০০্
৩০/১, লোক কলোনী

জগবন্ধু পাত্র ৪০০্
৫৬, রাম ভাদুড়ী লেন
লতিকা চৌধুরী ৩০০্
১৭, গান্ধী পার্ক

খাতাখানা ব্যোমকেশের হাতে দিয়ে রাখালবাবু বললেন, 'দেখুন যদি কিছু হদিস পান।'

ব্যোমকেশ খাতাখানা মন দিয়ে পরীক্ষা করে বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে লোকটার পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা।'

'অন্য পেশা কি সম্ভব নয়? যেমন ধরুন, বীমার দালাল।'

'অসম্ভব বলছি না। কিন্তু বীমার দালালকে কেউ খুন করে না। তারা ছদ্মনামেও ঘুরে বেড়ায় না।'

'তাহলে আপনি মনে করেন, রাজকুমার বসু যাদের ব্ল্যাকমেলা করছিল তাদের মধ্যে কেউ তাকে খুন করেছে?'

'কলকাতার ফিরিস্তিতে যাদের নাম আছে তাদের সওয়াল করলে কতকটা আন্দাজ করা যাবে।–চলুন, এবার তিন নম্বর মক্কেলের সঙ্গে দেখা করা যাক।'

‘চলুন।’

তিন নম্বর ঘরে শচীতোষ সান্যাল বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিলেন, পদশব্দ শুনে ঘাড় তুললেন। বললেন, ‘কে?’

রাখালবাবু সংক্ষেপে বললেন, ‘পুলিস।’

শচীতোষবাবু উঠে বসলেন, চক্ষু গোল করে বললেন, ‘পুলিস! কী চাই?’

রাখালবাবু বললেন, ‘আপনাকে দুচারটে প্রশ্ন করতে চাই। জানেন বোধহয় পাশের দুনিম্বর ঘরে খুন হয়েছে।’

শচীতোষবাবু মুহূর্তকাল নির্বাক থেকে আঁৎকে উঠলেন, ‘খুন হয়েছে! কে খুন হয়েছে?’

তিন নম্বর ঘরটি আয়তনে এবং আসবাবপত্রে অন্য দু’টি ঘরের অনুরূপ। রাখালবাবু বিছানার ধারে বসলেন। ব্যোমকেশ চেয়ারে বসল। রাখালবাবু বললেন, ‘দু নম্বরে যিনি ছিলেন কাল রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন, তাঁর নাম রাজকুমার বসু। আপনি তাঁকে চিনতেন নাকি?’

‘রাজকুমার বোস-না, চিনতাম না। কে খুন করেছে?’

'তা এখন জানা যায়নি। আপনার নাম কি?'

'শচীতোষ সান্যাল।'

'নিবাস?'

'ভাগলপুর। — আমার শরীর খারাপ, ডাক্তার শুয়ে থাকতে বলেছে।'

'কোন ডাক্তার?'

'মেয়ে ডাক্তার। ঠাণ্ডা লেগেছে, অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকতে বলল। আচ্ছা, মেয়েরা কি ভাল ডাক্তার হয়?'

'হাতে বাধা নেই। ঠাণ্ডা লাগালেন কি করে?

'কাল সন্ধ্যের পর বেরিয়েছিলাম। গায়ে আলোয়ান ছিল না, ঠাণ্ডা লেগে গেছে।'

'রাত্তিরে ঘর থেকে বেরোননি?'

'না। ন'টার সময় ডাইনিং রুম থেকে খেয়ে এসে ঘরে ঢুকেছিলাম, আর বেরোইনি।'

‘ও কথা থাক। আপনি কবে কলকাতায় এসেছেন?’

‘তিন দিন হলো। আজ ফিরে যাবার কথা, কিন্তু

‘আপনি কলকাতায় এসেছেন কেন?’

‘আমার ঘিয়ের ব্যবসা আছে, গাঙ্গুরামকে ঘি যোগান দিই। তাই মাঝে মাঝে আসতে হয়। আচ্ছা, ঠাণ্ডা লাগা থেকে তো নিউমোনিয়া হতে পারে।’

‘তা পারে, কিন্তু আপনার হবে না। আপনি বেশ তাগড়া আছেন।–বয়স কত?’

‘বিয়াল্লিশ। দেখতে তাগড়া বটে, কিন্তু আমার শরীর ভারি পলকা, একটুতেই রোগে ধরে। বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে; কিছু খেলে রোগ বেড়ে যাবে না তো?’

‘গরম দুধ আর পাউরুটি খান। — রাজকুমার বোসকে তাহলে চিনতেন না?’

‘না, কখনো নাম শুনিনি।’

ব্যোমকেশ বলল, ‘সুকান্ত নামটা কখনো শুনেছেন?’

শচীতোষ বললেন, 'সুকান্ত? না। আমার শালার নাম ছিল শ্রীকান্তকুমার লাহিড়ী, মারা গেছে।'

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে আপনি পাশের ঘরে কোনো শব্দ শুনেছিলেন?'

'শব্দ? নাঃ। খেয়ে এসেই শুয়েছি, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। বউ বলে, আমি একবার ঘুমেলে ডাকাত পড়লেও ঘুম ভঙে না। পাশের ঘরের লোকটাকে কী দিয়ে খুন করেছে? বন্দুক দিয়ে?'

'না, ছুরি দিয়ে।' রাখালবাবু উঠে পড়লেন, 'আপনি পুলিসকে খবর না দিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবেন না। চলুন ব্যোমকেশদা।'

নীচে অফিস-ঘরে হরিশচন্দ্র জবুথবুভাবে বসেছিলেন, ব্যোমকেশদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন , কুণ্ঠিত প্রশ্ন করলেন, 'কী হলো?'

রাখালবাবু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'এবার আপনাদের, অর্থাৎ হোটেলের স্টাফের এজেহার নেব। আপনাকে দিয়েই আরম্ভ করি। বসুন।'

তিনজনে বসলেন। রাখালবাবু সওয়াল-জবাব আরম্ভ করলেন, 'আপনার পুরো নাম?'

'হরিশচন্দ্র হোড়।'

'আপনি হোটেলের ম্যানেজার। এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন আছেন?

'আট বছর।'

'মৃত রাজকুমার বোস সম্বন্ধে কী জানেন বলুন।'

হরিশচন্দ্র মোটা খাতা বার করে খুললেন, 'রাজকুমার বসু্, ঠিকানা আদমপুর, পাটনা। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি বছরে দু'বার এখানে আসতেন, দু' তিনদিন থাকতেন। হোটেল থেকে বেরুতেন না, এই অফিসে এসে তিন-চারজন বন্ধুকে টেলিফোন করতেন। তাঁরা এসে সন্ধ্যের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'এবার তিনি কবে এসেছিলেন?'

'পরশু।'

'টেলিফোন করেছিলেন?'

‘পরশু রাত্রে এলেন, সে-রাত্রে টেলিফোন করেননি। কাল সকালে করেছিলেন।’

‘রাজকুমারবাবু যখন আসতেন ওই দু’ নম্বর ঘরেই থাকতেন?’

না, যখন যে-ঘর খালি থাকত সেই ঘরে থাকতেন।’

‘রাজকুমারবাবুকি কাজ করতেন। আপনি জানেন?

‘আজ্ঞে না।’

‘আপনি কাল রাত্রে নিশ্চয় হোটেলেই ছিলেন?’

‘আজ্ঞে–’। হরিশচন্দ্র একটু ইতস্তত করে বললেন, ‘ঘণ্টা দুয়ের জন্যে একবার বেরিয়েছিলাম। আমি হোটেলে থাকি বটে, কিন্তু আমার পরিবার বাইরে ভাড়া বাড়িতে থাকে; মাঝে মাঝে তাদের দেখতে যাই। কাল রাত্রে অতিথিরা খেতে বসবার পর আমি বেরিয়েছিলাম, তারপর এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।’

‘আপনার অবর্তমানে হোটেলের ইন-চার্জ থাকে কে?’

‘সদার খানসামা গুণধর গুঁই।’

'গুণধরকে একবার ডাকুন।'

গুণধরকে ডাকা হলো, সে এসে দাঁড়াল। আবার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হলো।

'রাজকুমার বোস–যিনি খুন হয়েছেন–তাঁর সম্বন্ধে তুমি কী জান?'

'আজ্ঞে, বেশি কিছু জানি না। তিনি মাঝে মাঝে আসতেন, দু' তিনদিন থেকে চলে যেতেন।'

'তোমার সঙ্গে তাঁর কোনো কথাবার্তা হতো না?'

'আজ্ঞে, খুব কম। ফাই-ফরমাস করতেন, তার বেশি নয়।'

'তাঁর দেখাশোনা করত কে?'

'আজ্ঞে, আমি করতাম। সকালে বেড়-টি নিয়ে যেতাম, তারপর ব্রেকফার্স্ট লাঞ্চ ডিনার সব আমিই পৌঁছে দিতাম। দোতলায় যাঁরা থাকেন আমিই তাঁদের দেখাশোনা করি। তেতিলায় দেখাশোনা করে–'

'ও—তাহলে রাজকুমারবাবু ডাইনিং রুমে খেতে নামতেন না।'

'আজ্ঞে না।'

'কাল তুমি তাঁকে শেষবার কখন দেখেছ?'

'রাত্রি পৌঁনে ন'টার সময় তাঁকে ডিনার দিতে গেছলাম, তারপর নাটার সময় এটো বাসন-কোসন আনতে গেছলাম। তখন তিনি বেঁচে ছিলেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু তিনি ডাইনিং রুমে যেতেন না কেন বলতে পার?'

'তা-জানি না হুজুর। তবে— বোধহয়–তাঁর মুখখানা কাটাকুটি হয়ে বড় ইয়ে হয়ে গিয়েছিল-তাই তিনি সহজে লোকের সামনে বেরুতেন না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে লোক আসত?'

'তা আসত হুজুর।'

'কাল কে কে এসেছিল তুমি জান?

'আমি জানি না, জেনারেল সিং বলতে পারে।'

‘জেনারেল সিং।’

‘আজ্ঞে, আমাদের দারোয়ান। তার নাম রামপিরিত সিং, সবাই তাকে জেনারেল সিং বলে ডাকে।‘

‘ডাকো জেনারেল সিংকে।’

ভোজপুরী জোয়ান রামপিরিত সিং এসে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করল। আখাম্বা চেহারা, জাঁদরেল পোশাক, ইয়া গোঁফ। রাখালবাবু তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, ‘হ্যাঁ, জেনারেল বটে। তুমি হোটেলের সদরে পাহারা দাও?’

রামপিরিত বলল, ‘জি। সকালে নটা থেকে বারোটা, বিকেলে পাঁচটা থেকে দশটা আমার ডিউটি।‘

‘হোটেলে যারা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের নাম-ধাম তুমি লিখে রাখ?’

‘জি না, সে-রকম হুকুম নেই। যারা ভাল সাজ-পোশাক পরে আসে তাদের স্যালুট করি, যারা অতিথির রুম নম্বর জানতে চায় তাদের রুম নম্বর বলি।’

‘কাউকে আটকাও না?’

'জি, ভাল জামা-কাপড় পরা থাকলে আটকাই না।'

'আর যদি ছেঁড়া জাম-কাপড় হয়?'

'তখন কটমট করে তাকাই।'

'শাবাশ। এবার বল দেখি, কাল সন্ধ্যের পর দোতলার দু' নম্বর ঘরের বাবুর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'জি, এসেছিল। দু'জন মরদ আর একজন ঔরৎ। রাত্রি সওয়া ন'টার সময় এলেন ঔরৎ, তিনি ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে দোতলায় গেলেন; পাঁচ মিনিট পরে তিনি চলে গেলেন।'

'তাঁর বয়স কত?

'বিশ-পঁচিশ হবে হুজুর। গোরী, পাতলা লম্বা চেহারা, চোখে চশমা ছিল।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর সাড়ে ন'টার সময় এলেন এক মরদ। তিনি ঘরের নম্বর নিয়ে ওপরে গেলেন, পাঁচ মিনিট পরে ফিরে চলে গেলেন। এর চেহারা দুবলা, মুছ-দাড়ি আছে। থোড়া থোড়া।'

'তারপর?'

'পৌঁনে দশটার সময় আর একজন মরদ এলেন। মোটা-তাজা শরীর, খাঁটি বাঙ্গালী বাবু। তিনিও ওপরে গিয়ে পাঁচ মিনিট ছিলেন। তারপর আমার ডিউটির মধ্যে আর কেউ আসেনি হুজুর।'

জেনারেল রামপিরত সিং-এর চেহারা যত স্থূলই হোক, স্মৃতিশক্তি যে খুব তীক্ষ্ণ তাতে সন্দেহ নেই। রাখালবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা। তুমি এখন আরাম কর গিয়ে।'

জেনারেল জোড়া পায়ে স্যালুট করে চলে গেল।

রাখালবাবু পকেট থেকে ১২০০ টাকার নোট বার করে হরিশচন্দ্রের হাতে দিলেন, বললেন, 'আপাতত এ টাকাটা আপনার কাছে রাখুন, মৃতের সুটকেসে পাওয়া গেছে। টাকার জন্যে একটা রসিদ দিন।'

ঘরে একটি লোহার সিন্দুক ছিল, হরিশচন্দ্র নোটগুলি সিন্দুকে রেখে রসিদ লিখে দিলেন। ব্যোমকেশ ভুরু কুঁচকে বসে রইল।

ইতিমধ্যে সাব-ইন্সপেক্টর দু'জন নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল, রাখালবাবু তাদের প্রশ্ন করলেন, 'কি হলো?'

একটি সাব-ইন্সপেক্টর বলল, 'আমি তেতলায় গিয়েছিলাম। সকলের নাম-ধাম লিখে দুয়েছি, সকলেই বলল, ন'টার পর ভিলার খেয়ে তার ঘরে ফিরে এসেছিল, আর ঘর থেকে বেরোয়নি।'

'তাদের কথা সত্যি কিনা যাচাই করেছিলে?'

'কি করে যাচাই করব? প্রত্যেকের আলাদা ঘর। তবে একটা প্রমাণ আছে, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হলে একটা চাকর তেতলার সিড়ির সামনে শোয়; তাকে ডিঙিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামা সম্ভব নয়। আমি চাকরিটাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে বলল, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে শুতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামেনি।'

'বেশ। —আর তুমি?'

দ্বিতীয় সাব-ইন্সপেক্টর বলল, 'দোতলাতেও একই অবস্থা। সকলের নাম-ঠিকানা লিখে নিয়েছি। দোতলার সিঁড়ির মুখে যো-চাকরটা শোয় সে বলল, পৌঁনে এগারোটার সময় সে শুতে গিয়েছিল, তারপর আর কেউ ঘর থেকে বেরোয়নি।'

ম্যানেজার বললেন, 'রাত্রে যদি কোনো অতিথির কিছু দরকার হয়, তাই এই ব্যবস্থা।'

'বুঝলাম।'–রাখালবাবু ঘড়ি দেখলেন, বারোটা বেজে গেছে। তিনি ব্যোমকেশকে বললেন, 'এখানকার কোজ আপাতত এই পর্যন্ত। চলুন এবার বেরিয়ে পড়া যাক, রাস্তায় কোথাও

খেয়ে নেওয়া যাবে। ভাগ্যক্রমে চারজন মক্কেলের বাড়ি কাছাকাছির মধ্যেই, বেশি ঘোরাঘুরি করতে হবে না। আপনার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল–'

ব্যোমকেশ বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই, আমি অজিতকে টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

সে টেলিফোন তুলে নিল। হরিশচন্দ্র বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে এখানেই আপনাদের সকলের আহারের ব্যবস্থা করেছি।'

রাখালবাবু হেসে বললেন, 'খুব ভাল কথা।'

০২. নিরুপমা হোটেলের রান্না ভাল

নিরুপমা হোটেলের রান্না ভাল।

মধ্যাহ্ন ভোজন দেশী ও বিলাতি মতে সমাধা করে পুলিসের দল ডাইনিং রুম থেকে বেরুলেন, সঙ্গে ব্যোমকেশ। রাখালবাবু দ্বিতীয় সাব-ইন্সপেক্টরকে বললেন, ‘দত্ত, তুমি এখানে থাকে। এই নাও, দু’ নম্বর ঘরের চাবি। ফিঙ্গারপ্রিন্টের দল এখনি আসবে, তাদের ঘর খুলে দিও। আমি ঘোষকে নিয়ে বেরুচ্ছি। আসুন ব্যোমকেশদা।’

তিনজনে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাখালবাবু পকেট থেকে খাতা বার করে বললেন, ‘এ সময় কাউকে বাড়িতে পাব। কিনা বলা যায় না। যাহোক, চলুন আগে জগবন্ধু পাত্রকে দেখা যাক! লোকটিকে ওড্র-কুলোদ্ভব মনে হচ্ছে।’

ব্যোমকেশ বলল, ‘হুঁ।’

একটা ট্যাক্সি ধরে তিনজনে উঠে বসলেন, ট্যাক্সি জগবন্ধু পাত্রের ঠিকানা লক্ষ্য করে ছুটিল। রাখালবাবু বললেন, ‘ব্যোমকেশদা, আজ আপনি এমন চুপচাপ কেন? কিছু বলছেন না।’

ব্যোমকেশ বলল, ‘এখন কেবল শুনে যাচ্ছি, বলা-কওয়ার সময় এখনো আসেনি।–সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।’

জগবন্ধু থাকেন একটি তেতলা বাড়ির নীচের ফ্ল্যাটে। রাখালবাবু কড়া নাড়লেন, একটি লোক দোর খুলে দাঁড়াল। ছাঁটা দাড়ি, কোল-কুঁজো ধরনের চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। রাখালবাবু বললেন, 'আপনার নাম জগবন্ধু পাত্র?

'হাঁ।' জগবন্ধু পুলিসের ইউনিফর্ম দেখে একটু সচকিত হয়ে বললেন, 'কি দরকার?'

'নিরুপমা হোটেলে রাজকুমার বসু নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন—'

'জগবন্ধু পাত্রের মুখে অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল, তিনি বলে উঠলেন, 'রাজকুমার খুন হয়েছে!' 'হ্যাঁ। আপনাকে দু' একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'আসুন।' জগবন্ধু পাত্র একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বসলেন, 'বসুন, আমি এখনি আসছি।'

তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বসবার ঘরটি ছোট এবং নিরাভরণ; একটি টেবিল ও তিনটি চেয়ার আছে; টেবিলের ওপর টেলিফোন। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু কোথাও গৃহস্বামীর চরিত্রের কোনো পরিচয় পেল না।

পাঁচ মিনিট কাটল, দশ মিনিট কাটল, জগবন্ধু পাত্রের দেখা নেই। রাখালবাবু তখন গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'জগবন্ধুবাবু!' কিন্তু উত্তর এল না।

ব্যোমকেশ মুখ টিপে হাসল, বলল, 'মনে হচ্ছে জগবন্ধু পাত্র গৃহত্যাগ করেছেন।'

রাখালবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'পালিয়েছে! এসো ঘোষ, বাড়ির ভেতরটা দেখা যাক। আসুন ব্যোমকেশদা।'

ব্যোমকেশ কিন্তু গেল না; ঘোষকে নিয়ে রাখালবাবু ভিতরে গেলেন। দেখলেন, কেউ নেই , খিড়কির দোর খোলা।

রাখালবাবু ফিরে এসে বললেন, 'পাখি উড়েছে।'

ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে টেবিলের দেরাজ খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করেছিল, তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'লোকটা বোধহয় ঘোড়দৌড়ের টাউট ছিল।'

'তাই নাকি! কিন্তু পালাল কেন?'

'নিশ্চয় গুরুতর গলদ আছে। শুধু ঘোড়দৌড় হলে পালাত না।'

রাখালবাবু থানায় ফোন করলেন। পলাতকের বর্ণনা দিলেন, আরো লোক ডেকে পাঠালেন। তারপর ফোন নামিয়ে বললেন, 'ঘোষ, তুমি এখানে থাকে, আমরা অন্য কাজে যাচ্ছি। এখনি থানা থেকে আরো লোক এসে পড়বে। বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাশ করো। আঙুলের ছাপ নিশ্চয় পাবে; ততক্ষণাৎ হেডু অফিসে পাঠিয়ে দেবে। লোকটা বোধহয় দাগী আসামী।'

জগবন্ধু পাত্রের বাসা থেকে বেরিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মনে হয়? জগবন্ধু পাত্রই আমাদের আসামী?

ব্যোমকেশ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলা যায় না। লোকটা রাজকুমারের মৃত্যু-সংবাদ শুনে চমকে উঠেছিল। তবে অভিনয় হতে পারে।'

অতঃপর মোহনলাল কুণ্ডুর বাসায় গিয়ে জানা গেল, কুণ্ডু মশাই কলকাতায় নেই। সস্ত্রীক কাশী গিয়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

সেখান থেকে তাঁরা শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর বাড়ি গেলেন। কিন্তু এখানেও নিরাশ হতে হলো। শ্যামাকান্ত বাড়ি নেই, অফিসে গেছেন। শ্যামাকান্ত পোর্ট কমিশনারের অফিসে বড় চাকরি করেন। এইটুকুই শুধু জানা গেল। সন্ধ্যের আগে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

রাখালবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাকি রইলেন শুধু লতিকা চৌধুরী। ইনি যখন মহিলা তখন আশা করা যায় দুপুরবেলা এঁকে বাসায় পাওয়া যাবে।'

শ্রীমতী চৌধুরী স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকেন, ফ্ল্যাট নয়। ছোটখাটো বাড়িটি, বেশ পরিচ্ছন্ন, সামনে একফালি ফুলের বাগান। ঘণ্টি বাজাতেই একটি চশমা-পরা মহিলা দোর খুলে বললেন, ‘কাকে চাই? কর্তা বাড়ি নেই।’ তারপরই তাঁর চকিত দৃষ্টি পড়ল রাখালবাবুর ইউনিফর্মের ওপর।

জেনারেল রামপিরিত যে বর্ণনা দিয়েছিল, মহিলাটির সঙ্গে তার মিল আছে। তবে বয়স বিশ-পঁচিশ নয়, আরো বেশি। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সেও কিন্তু ছিমছাম গড়ন এবং সুশ্রী মুখ থেকে যৌবনের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

রাখালবাবু বললেন, ‘আপনার নাম শ্রীমতী লতিকা চৌধুরী?’

শ্রীমতী চৌধুরীর ঠোঁট হঠাৎ আলগা হয়ে গেল, তিনি স্খলিতস্বরে বললেন, ‘হ্যাঁ। কি দরকার?’

রাখালবাবু বললেন, ‘আপনাকে দু-চারটে প্রশ্ন করতে চাই। আমি পুলিসের লোক।’

শঙ্কা-শীর্ণ মুখে মিসেস চৌধুরী বললেন, ‘আসুন।’

বসবার ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো; নীচু চেয়ার, সোফা, সেন্টার পিস। দেয়ালে একটি মধ্যবয়স্ক পুরুষের আবক্ষ ফটোগ্রাফ টাঙানো রয়েছে; মুখখানা কঠোর, চোখের নির্মম

দৃষ্টি দর্শককে সর্বত্র অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে; এ ঘরে থাকলে ওই সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু পাশাপাশি সোফায় বসলেন; শ্রীমতী চৌধুরী একটি চেয়ারের কিনারায় বসে ভয়ার্তা চোখে তাঁদের পানে চাইলেন।

‘আপনার স্বামীর নাম কি?’

‘তারাকুমার চৌধুরী।’

‘কি কাজ করেন?’

‘ইঞ্জিনীয়র। রেলের ইঞ্জিনীয়র।’

‘ছেলেপুলে?’

‘নেই। আমরা নিঃসন্তান।’

‘কাল রাত্রি সওয়া ন’টার সময় আপনি নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন?’

শ্রীমতী চৌধুরীর চোখ দু'টি চশমার ভেতরে বিস্ফারিত হলো, 'আমি! না না, আমি তো সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম।'

'হোটেলের দরোয়ান আপনাকে কাল দেখেছে, সে আপনাকে সনাক্ত করতে পারবে।'

শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি ঠোঁট চেটে বললেন, 'কিন্তু আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম–আলেয়া সিনেমাতে। টিকিটের প্রতিপত্র দেখাতে পারি।'

'আপনি সিনেমার টিকিট কিনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ছবি শেষ হবার আগেই নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন, রাজকুমার বোসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'

রাজকুমারের নাম শুনে শ্রীমতী চৌধুরীর মুখ মড়ার মত হয়ে গেল। তাঁর ঠোঁট দুটো অস্ফুটভাবে নড়তে লাগল, 'রাজকুমার বসু–তাকে তো আমি চিনি না—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করল, 'সুকান্ত সোমকে চেনেন?'

শ্রীমতী চৌধুরী জলবদ্ধ হরিণীর মত ব্যোমকেশের পানে চাইলেন, তারপর দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলল, 'আমরা জানি, রাজকুমার বোস আর সুকান্ত সোম একই ব্যক্তি। সে আপনাকে ব্ল্যাকমেলা করছিল। কাল রাত্রি সওয়া ন'টার সময় সিনেমা-ফেরত

আপনি তাকে টাকা দিতে গিয়েছিলেন। এখন বাকি কথা সব বলুন, আপনার কোনো ভয় নেই।'

শ্রীমতী চৌধুরী কিছুক্ষণ ফোঁপালেন, তারপর চোখ মুছে মুখ তুললেন, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'বলছি। কেন জানতে চান আপনারাই জানেন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আমার স্বামী যেন কিছু জানতে না পারেন।'

ব্যোমকেশ দেয়ালের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ইনি আপনার স্বামী?'

'হ্যাঁ।' 'কড়া প্রকৃতির লোক মনে হয়। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা কাউকে কিছু বলব না।'

তারপর মিসেস চৌধুরী লজ্জানত চোখে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে যে কাহিনী বললেন তার সারাংশ এই :

বারো-তেরো বছর আগে শ্রীমতী চৌধুরী যখন কুমারী ছিলেন তখন তাঁর প্রকৃতি ছিল অন্য রকম, তিনি নিজেকে সংস্কারমুক্ত অতি-আধুনিক মনে করতেন। বাপের বাড়িতে টাকা ছিল বেশি, শাসন ছিল কম। লতিকা চক্রবর্তী বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে হৈ হৈ করে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে সময় কাটাতেন।

সে-সময় চিত্র-জগতে সুকান্ত সোম নামে একজন হীরো ছিল, যেমন তার চেহারা তেমনি অভিনয়। লতিকা চক্রবর্তী তার প্রেমে পড়ে গেলেন, সাধারণ প্রেম নয়, একেবারে বাঁধন-ছেড়া প্রেম। তিনি সুকান্তকুমারকে প্রবল অনুরাগপূর্ণ চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হতে লাগল।

লতিকা সুকান্তকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন, কিন্তু একদিন জানতে পারলেন , সুকান্তর ঘরে একটি স্ত্রী আছে। তাঁর প্রেমে ভাটা পড়ল। তাঁর বাবা বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

তারপর দু'বছর কাটল। লতিকা দেবীর স্বামী লোকটি অতিশয় সজ্জন। কিন্তু যৌন শিথিলতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত কড়া। বিয়ের পর লতিকা চৌধুরীর রোমাঞ্চের নেশা ছুটে গিয়েছিল, স্বামীকে তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। সন্তানাদি না হলেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়ে উঠেছিল।

একদিন কাগজে ভয়ঙ্কর খবর বেরুল, সুকান্ত নিজের স্ত্রীকে খুন করেছে। কেস আদালতে উঠল। আসামী অবশ্য খালাস পেয়ে গেল, কারণ সে আত্মরক্ষার্থে খুন করেছে; স্ত্রী ছুরি নিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল, তার মুখ এবং সবঙ্গে কেটে ফালা-ফালা করে দিয়েছিল, সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে স্ত্রীকে গলা টিপে মেরেছে। যতদিন মোকদ্দমা চলেছিল। ততদিন লতিকা দেবী ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলেন, পাছে কোনো সূত্রে তাঁর নামটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সাক্ষী বা আসামী কেউ তাঁর নাম করল না; তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

অতঃপর দু-তিন বছর নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

সুকান্তর সিনেমার কাজ শেষ হয়েছিল; ও রকম একটা মুখ নিয়ে সিনেমার হীরো সাজা যায় না। সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল। হঠাৎ একদিন সুকান্ত তার বীভৎস মুখ নিয়ে লতিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করল, বলল, 'আমার টাকার দরকার, তোমাকে দিতে হবে। বেশি নয়, ছাঁ মাস অন্তর তিন শো টাকা; তোমার পক্ষে অতি সামান্য। যদি না দাও, তুমি আমাকে যে-সব চিঠি লিখেছিলে সেগুলি তোমার স্বামীকে দেখাব।'

সেই থেকে শ্রীমতী চৌধুরী ছ' মাস অন্তর তিন শো টাকা গুনছেন। ছ' মাসে তিন শো টাকা তাঁর গায়ে লাগে না, কিন্তু সদাই ভয়, পাছে স্বামী জানতে পারেন।

কাল রাত্রে তিনি টাকা দিতে নিরুপমা হোটেলে গিয়েছিলেন, দু'নম্বর ঘরের দোরের বাইরে থেকে সুকান্ত সোমকে টাকা দিয়ে চলে এসেছিলেন। আর কিছু জানেন না।

শ্রীমতীর কাহিনী শেষ হলে শ্রোতা দু'জন কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আচ্ছা, আজ আমরা যাই। একটা সুখবর দিয়ে যাই, কাল রাত্রি সওয়া নটা থেকে এগারোটার মধ্যে সুকান্ত সোম ওরফে রাজকুমার বোস খুন হয়েছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জনে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালেন। রাখালবাবু বললেন, 'শ্রীমতীর আত্মকথা তো শুনলাম। কিন্তু খুনের হদিস পাওয়া গেল না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'একেবারে কিছুই পাওয়া যায়নি এমন কথা বলা যায় না। আজ যতগুলি লোকের এজেহার শুনেছি তাদের মধ্যে একজন একটা বেফাঁস কথা বলেছে। কিন্তু কে বলেছে। মনে করতে পারছি না।'

'কী বেফাঁস কথা?'

'সেইটেই মনে আসছে না। অনেক কথার মধ্যে ওই কথাটা মগ্নচৈতন্যে ডুব মেরেছে।'

রাখালবাবু ঘড়ি দেখলেন, প্রায় তিনটে বাজে। বললেন, 'আমি এখন থানায় ফিরব। আপনি?'

'আমি একবার নতুন বাড়ির কাজকর্ম তদারক করে বাসায় ফিরব। কাল সকালে আবার দেখা হবে। ইতিমধ্যে যদি নতুন খবর কিছু পান, দয়া করে টেলিফোন করবেন।'

পাঁচটার পর বাসায় ফিরে ব্যোমকেশ এক পেয়ালা চা খেল, তারপর সিগারেট ধরিয়ে তক্তপোশের ওপর লম্বা হলো। অজিত বাড়ি নেই, সাড়ে চারটের সময় দোকানে গেছে। ব্যোমকেশ একলা একলা চোখ বুজে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

সাড়ে ছাঁটার সময় সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সত্যবতী কী একটা কাজে ঘরে এসেছিল, চমকে উঠে বলল, 'কি হলো?'

ব্যোমকেশ উদ্ভাসিত মুখে বলল, 'মনে পড়েছে!'

'কী মনে পড়ল?'

'কাছে এসো, কানে কানে বলছি।'

কানে কানে কথা শুনে সত্যবতী হাসিমুখে ব্যোমকেশের বাহুতে একটি ছোট্ট চড় মারল। ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে একবার বেরুতে হবে।'

'আবার বেরুবে। কোথায় যাবে?'

'কালকেতু খবরের কাগজের অফিসে। দশ বছরের পুরনো কাগজের ফাইল দেখতে হবে।'

'ফিরতে নিশ্চয় রাত করবে। জলখাবার খেয়ে যাও।'

'দরকার নেই। পেটে নিরুপমা হোটেলের গদ আছে।'

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে টেলিফোন করল, 'তাজা খবর কিছু আছে নাকি?'

রাখালবাবু বললেন, 'সাড়া-জাগানো কোনো খবর নেই। লাশ পরীক্ষা করে অপ্রত্যাশিত কোনো খবর পাওয়া যায়নি; মৃত্যুর সময় ডিনারের আন্দাজ দেড় ঘণ্টা পরে। দুনম্বর ঘরে রাজকুমার আর গুণধরের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। — শ্যামাকান্ত লাহিড়ীর বাসায় আবার গিয়েছিলাম; সে পরিষ্কার অস্বীকার করল, বলল, নিরুপমা হোটেলে যায়নি। জেনারেল রামপিরিত কিন্তু তাকে সনাক্ত করেছে। শ্যামাকান্তকে অ্যারেস্ট করিনি, কিন্তু তার পেছনে লেজুড় লাগিয়েছি।'

'তারপর?

'জগবন্ধু পাত্রের আসল নাম জানা গিয়েছে–ভগবান মহান্তি। দাগী আসামী; মেদিনীপুরে একটা স্ত্রীলোককে খুন করে চৌদ্দ বছর জেলে গিয়েছিল, তারপর জেল ভেঙে পালায়। কলকাতায় এসে ছদ্মনামে ঘোড়দৌড়ের দালালি করছিল।'

'আর কিছু?'

'লিতিকা দেবীর স্বামী তারাকুমার চৌধুরী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম। তিনি সে-রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ কোথায় ছিলেন জানা যাচ্ছে না।'

‘জানার দরকার নেই। হোটেলের খবর কি?’

‘হোটেলের অতিথিরা বড় অস্থির হয়ে উঠছেন। ভাবছি আজ বিকেলবেলা তাদের ছেড়ে দেব।–আপনি কিছু পেলেন?’

‘পেয়েছি। আমি এখনি নিরুপমা হোটেলে যাচ্ছি। আপনিও আসুন।’

এক নম্বর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাখালবাবু ও ব্যোমকেশের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। রাখালবাবু দোরে টোকা দিলেন।

দোর খুলে গেল। মিসেস শোভনা রায় রাখালবাবুকে দেখে জ্বলে উঠলেন, ‘এই যে। আপনি আর কতদিন আমাকে আটকে রাখবেন। আমার মত একজন ডাক্তারকে এমনভাবে আটকে রাখা আইনবিরুদ্ধ তা জানেন কি?’

রাখালবাবু বললেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো নালিশ থাকে আদালত আছে। আপাতত আপনাকে আমরা দু-চারটে কথা বলতে চাই।’

দু’জনে ঘরে প্রবেশ করলেন, ব্যোমকেশ চেয়ারে বসে বলল, ‘আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই, মিসেস রায়।’

মিসেস বায় আবার জ্বলে উঠলেন, রূঢ়কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আবার কে! ঠাট্টা করছেন নাকি?'

রাখালবাবু বললেন, 'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। নাম শুনে থাকবেন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'ঠাট্টা করছি না, মোটেই ঠাট্টা করছি না। আপনি বসুন।'

ব্যোমকেশের নাম শুনে মিসেস রায় থতিয়ে গিয়েছিলেন, খাটের ধারে বসলেন। রুক্ষ স্বর যথাসম্ভব নরম করে বললেন, 'কি বলবেন বলুন। আমি কিন্তু আজই বহরমপুর ফিরে যাব।'

ব্যোমকেশ বলল, 'সেটা ভবিষ্যতের কথা।—গল্পটি খবরের কাগজে পড়লাম, সংক্ষেপে শোনাচ্ছি। —সুকান্ত সোম একজন সিনেমা আর্টিস্ট ছিল—'

মিসেস রায়ের শরীর শক্ত হয়ে উঠল, তিনি অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চেয়ে রইলেন। ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলল, 'চেনেন দেখছি। চেনবারই কথা, সে আপনার জামাই ছিল। —সুকান্ত সোম সিনেমা করে খুব নাম করেছিল। আপনি তখন বর্ধমানে প্র্যাকটিস করতেন। বিধবা মানুষ, সংসারে কেবল একটি মেয়ে। বর্ধমানে সুকান্তের যাওয়া-আসা ছিল। সে একদিন আপনার মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে ইলোপ করল। সুকান্ত

আপনার মেয়েকে লোভ দেখিয়েছিল তাকে সিনেমার হিরোইন করবে। আপনি সুকান্তকে পছন্দ করতেন না, তাই ইলোপমেন্ট।

‘একসঙ্গে কিছু দিন বাস করবার পর দু’জনের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ল; দু’জনেরই মিলিটারি মেজাজ। ঝগড়া আরম্ভ হলো। ঝগড়ার প্রধান কারণ, সুকান্ত আপনার মেয়েকে হিরোইন বানাতে পারেনি। একদিন ঝগড়া চরমে উঠল, আপনার মেয়ে ছুরি দিয়ে সুকান্তর মুখ কেটে ফালা-ফালা করে দিল। সুকান্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আপনার মেয়েকে গলা টিপে খুন করল।

‘খুনের আসামী সুকান্ত তিন মাস পুলিসের হাসপাতালে রইল। সেখান থেকে তাকে যখন বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করা হলো তখন তার বীভৎস মুখ দেখে জজ সাহেব পর্যন্ত চমকে গেলেন। জেলের হাসপাতালে প্লাস্টিক সাজারির ব্যবস্থা নেই; সুকান্তর মুখের ঘা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু সিনেমার হিরোর পার্ট করার মত মুখ আর নেই।

‘বিচার হলো। আপনি সুকান্তর বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিলেন, মিসেস রায়। কিন্তু তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারলেন না। তার হাতে অস্ত্র ছিল না, আপনার মেয়ের হাতে অস্ত্র ছিল; আত্মরক্ষার অজুহাতে সুকান্ত ছাড়া পেয়ে গেল।’—

মিসেস শোভনা রায় আগুন-ভরা চোখে বললেন, ‘মিছে কথা। ও আগে আমার মেয়েকে গলা টিপে মেরেছিল, তারপর নিজে নিজের মুখ ছুরি দিয়ে কেটেছিল।’,

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল, ‘কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুকান্ত সিনেমা আর্টিস্ট, সে কখনো নিজের মুখে ছুরি মেরে নিজের আখের নষ্ট করত না; নিজের গায়ে ছুরি মারত। যাহোক, সুকান্ত খুনের দায় থেকে রেহাই পেল বটে, কিন্তু তার সিনেমা-জীবন শেষ হয়ে গেল। সৎপথে থেকে অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা অর্জনের রাস্তা সে জানত না, সে কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে পাটনায় বাসা বাঁধিল এবং ব্ল্যাকমেলের ব্যবসা শুরু করল। গত দশ বছরে কলকাতায় কটকে কাশীতে দিল্লীতে তার অনেক খদ্দের জুটেছে। কারুর ওপর সে অযথা উৎপীড়ন করে না, ছ’ মাস অন্তর এসে বাঁধা-বরাদ্দ আদায় তসিল করে। এই তার জীবিকা।

‘সুকান্ত যখন আদায় তসিলের জন্যে কলকাতায় আসত তখন এই নিরুপমা হোটেলেই থাকত। আপনি ইতিমধ্যে বর্ধমানের বাস তুলে দিয়ে বহরমপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছেন, আপনিও মাঝে-মধ্যে এসে এই হোটেলে থাকেন। কিন্তু ঠিক একই সময়ে দু’জনের আসা আগে ঘটেনি, আপনি সুকান্তকে এখানে দেখেননি।

‘দৈবক্রমে এবার আপনি তাকে দেখতে পেলেন, সে আপনার পাশের ঘরেই উঠেছে। সে বোধ হয় আপনাকে দেখতে পায়নি। পেলে সাবধান হতো। আপনি তাকে পেলে খুন করবেন। এই ধরনের একটা ইচ্ছে আপনার মনে ছিল, কিন্তু দশ বছর সে-আগুন ছাই-চাপা পড়েছিল। এখন সুকান্তকে হাতের কাছে পেয়ে ছাই-চাপা আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আপনার মেয়েকে যে খুন করেছে তাকে আপনি বেঁচে থাকতে দেবেন না। আপনার মেয়ে বোধ হয় আপনার কাছ থেকেই তার উগ্র হিংস্র প্রকৃতি পেয়েছিল।

‘সে-রাত্রে ডিনার খেয়ে এসে আপনি নিজের ঘরে অপেক্ষা করে রইলেন। কিভাবে তাকে খুন করবেন তার প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছেন; এখন শুধু শুভমুহূর্তের অপেক্ষা।

‘সওয়া নটা থেকে সুকান্তর ঘরে লোক আসতে শুরু করল। আপনি নিজের ঘরে ওত পেতে আছেন। দশটার সময় লোক আসা বন্ধ হলো। আপনি অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরুলেন। দোতলার অন্য অতিথিরা দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে, যে-চাকরটা সিঁড়ির সামনে শোয় সে এখনো আসেনি। এই সুযোগ।

‘আপনি দু’ নম্বর দোরে টোকা দিলেন। সুকান্ত তখন শুয়ে পড়েছিল, সে উঠে দোর খুলল; আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে অস্ত্রটা ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর দোর টেনে বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। আপনার সঙ্গে যে রাজকুমার বোসের সম্বন্ধ আছে তা কেউ জানে না, আপনাকে কে সন্দেহ করতে পারে! বরং রাত্রে যারা রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সন্দেহ পড়বে তাদের ওপর।

‘আপনি একটি ছোট্ট ভুল করেছিলেন। ইন্সপেক্টর যখন আপনাকে জেরা করেন তখন আপনি বলেছিলেন, রাজকুমারকে আপনি আগে কখনো দেখেননি; তার পরেই বললেন, ও মুখ দেখলে মনে থাকত। রাজকুমারের মুখ যে মনে রাখার মত তা আপনি জানলেন কি করে? ঘরের দিকে

রাজকুমারের মুখ আপনি দেখতে পাননি। এই বেফাঁস কথাটা যদি আপনি না বলতেন তাহলে দশ বছরের পুরনো খবরের কাগজের ফাইল দেখার কথা আমার মনে আসত না।'

এই পর্যন্ত বলে ব্যোমকেশ চুপ করল। মিসেস রায় কামারের হাপরের গানগনে আগুনের মত জ্বলতে লাগলেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'সব মিছে কথা। সুকান্ত আমার মেয়েকে খুন করেছিল, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি। কি দিয়ে খুন করব? আমার কাছে কি ছোরা-জুরি আছে?'

ব্যোমকেশ তাঁর ডাক্তারি ব্যাগের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আছে। ওই ব্যাগের মধ্যে আছে।'

মিসেস রায়ের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেল।

'না, নেই। এই দেখুন—'

ব্যাগ খুলে ক্ষিপ্র হস্তে তার ভিতর থেকে তিনি একটি কাঁচি বার করলেন। লম্বা লিকলিকে সার্জিকাল কাঁচি, তার দুটো ফলা আলাদা করা যায়। মিসেস রায় কাঁচির একটা ফলা খুলে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু রাখালবাবু প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বিদ্যুৎবেগে মিসেস রায়ের মণিবন্ধ চেপে ধরলেন। মিসেস রায় উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, 'ছেড়ে দাও–ছেড়ে দাও

ব্যোমকেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অস্ত্রটাও পাওয়া গেছে। ওটা না পেলে মুশকিল। হতো।'